টিপু সুলতান

জলধর মল্লিক

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

লেখকের নিবেদন

আঠারো শতকের শেষভাগে ১৭৮২-১৭৯৯ পর্যন্ত মহীশূরের অধিপতি ছিলেন টিপু সুলতান। নিজের সময়ে মহীশূর শার্দুল অর্থাৎ মহীশূরের বাঘ বলে পরিচিত টিপু সুলতান ভারতের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের সংগ্রামে এমন এক নজির সৃষ্টি করেছেন যা এককথায় অতুলনীয়, অনন্য। জীবন দিয়েছেন কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করেননি। ভারতের রাজাবাদশাদের মধ্যে টিপুর বাবা হায়দার আলিই প্রথম বুঝতে পারেন ইংরেজরা আর পাঁচটা ভারতীয় রাজাবাদশাদের মতো নয়। এরা ভারতের রাজাবাদশাদের ছলেবলে কৌশলে পদানত করে সারাভারতকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। টিপুও এই ভাবনায় বাবার মতো সমান ভাবে জারিত হয়েছিলেন। ইংরেজদের ভারত নামের উপনিবেশের সর্বোচ্চ প্রশাসক বড়োলাট লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেসলি ছাড়াও এদেশে তাদের কয়েকজন ইংরেজ সেনানায়কের বিলেতে ইংরেজ সরকারের কাছে লেখা চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় যে তারা

ভারতে সেই সময় সব থেকে বড়ো শক্তিশালী শত্রু হিসেবে দেখতেন মহীশূরাধিপতি টিপু সুলতানকে। দেখতেন ভারতে তাদের উপনিবেশ বিস্তারের সব থেকে বড়ো বাধা হিসেবে। অন্যদিকে টিপুর কাছে স্বাধীনতা ছিল রাজমুকুটের থেকেও পরমপ্রিয়। বিনিময় যোগ্য কোনো বিষয় নয় এটা। আর সেইজন্যেই, বশ্যতা স্বীকার করার পরিবর্তে নৃপতি হিসেব নিজের এবং নিজের রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে নিজের জীবনের বিনিময়েই টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে গেছেন। টিপু সুলতানের জীবনকথা নিয়ে বইপত্র যে নেই তা কিন্তু নয়। তবে তুলনামূলক ভাবে কমই বলতে হবে। আর যাও-বা পাওয়া যায়, তার বেশির ভাগই কেবল মাত্র ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ। সঠিক তথ্যেরও অভাব আছে কোনো কোনো বইয়ে।

টিপু সুলতান শুধু কী কেবল একজন স্বাধীনতাকামী নৃপতি ছিলেন বলেই ভারতের ইতিহাসে তার এক সেরা জায়গা হয়েছে?

টিপু সুলতান একজন স্বাধীনতাকামী নৃপতি ছিলেন তো বটেই, কিন্তু তার পাশাপাশি এমন কিছু অনন্য অবদান রেখে গেছেন যা শুধু অতুলনীয়ই নয়, রীতিমতো অবিস্মরণীয়। আজকে আমাদের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) সফল ভাবে শতাধিক রকেট মহাকাশে পাঠানোর কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এই রকেটের জনক যে হায়দার আলি এবং বিশেষ করে টিপু সুলতান সেকথা 'মিসাইল ম্যান' নামে খ্যাত ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞানী ড. এ পি জে আব্দুল কালাম তার বক্তৃতায়, লেখায়, আত্মজীবনী 'উইংস অফ ফায়ার'-এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে গেছেন। সামন্ততান্ত্রিক ভারতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রচলনের জনক তো এই টিপু সুলতানই। কৃষিতে, কারিগরি শিল্পে, সামরিক সংগঠনে, রাজস্ব নির্ণয়ের ব্যবস্থায়,

পররাষ্ট্রনীতিতে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি বেশ কিছু এমন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যেগুলি আধুনিক তো বটেই আর ওই সব ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনিই হলেন পথিকৃৎ। এই সকল বিষয়গুলি এই বইটিতে কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই চেষ্টা কতটা সফল হয়েছে তার সেরা বিচারক হলেন পাঠকবর্গ। এবিষয়গুলিতে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে পরিশ্রম সার্থক হল বলে মনে করব। বইটি লেখার জন্যে অনেকগুলি বই, মনোগ্রাফ, প্রবন্ধাদির সাহায্য নেওয়া হলেও তথ্যের জন্যে মূলত নির্ভর করেছি Mohibul Hasan-এর History of Tipu Sultan বইটি, Prof, Sheik Ali-র Tipu Sultan–Steps Towards Economic Development শীর্ষক প্রবন্ধ আর The Tiger and the Thistle নামের web site-র ওপর। সবিশেষ সহায়তা দিয়ে বইটি লেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে আমি আমার সহধর্মিণী পূরবী মল্লিকের কাছে অশেষ ঋণী।

পরিশেষে, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে যে এই পুস্তকটির প্রকাশক শ্রীশংকরীভূষণ নায়ক মহাশয়ের অশেষ উৎসাহ দানের ফলেই পুস্তকটি লিখতে শুরু করি এবং শেষও করতে পারি। এই জন্যে আমি শ্রীনায়ক মহোদয়ের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

নিবেদক
জলধর মল্লিক

কলকাতা
জানুয়ারি, ২০১৩

সূচিপত্র

আরম্ভের আগের কথা	১৩
বংশ পরিচয়	১৬
জন্মকথা ও বাল্যকাল	২৩
বিবাহ ও সন্তানসন্ততি	২৭
দৈনন্দিন জীবন	৩১
ব্যাঘ্রপ্রীতি	৪২
ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ	৫১
শাসন ব্যবস্থা	৬৬
রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি	৭২
সামরিক সংগঠন	৭৫
রকেট বাহিনীর কথা	৮২
অন্যান্য কর্মকাণ্ড	৮৯
অতুলনীয় এক ভারতীয় নৃপতি	১১১
পরিশিষ্ট-ক : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আব্দুল কালামের বক্তৃতার অংশবিশেষ	১২১
পরিশিষ্ট-খ : টিপুর বাণী/সরকারি আদেশ	১২৫

॥ আরম্ভের আগের কথা ॥

টিপু সুলতান। নামটা বাংলার মানুষের কাছে মোটেই অচেনা বা অজানা নয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে 'টিপু সুলতান' নামের নাটক উত্তর কলকাতার পেশাদারি থিয়েটারে কত যে রজনী অভিনীত হয়েছে তার হিসেব নেই। শখের থিয়েটারের দলও গ্রামেগঞ্জে এই নাটকটি অভিনয় করেছে। প্রবল ইংরেজবিরোধী এক চরিত্র হিসেবে টিপু সুলতান সেই সময় বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পরও বেশ কয়েক বছর টিপু সুলতান কেন্দ্রিক নাটক অভিনীত হতে দেখা গেছে। পাশাপাশি, পেশাদার, অপেশাদার যাত্রাদলের কাছে ওই সময়েই আকর্ষণীয় যাত্রাপালা ছিল টিপু সুলতানকে নায়ক করেই। ফলে, এই নামটির সঙ্গে বাংলার মানুষের পরিচয় হতে অসুবিধে হয়নি। প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, তাদেরকে দেশ থেকে হঠাতে এক মুহূর্তের জন্যেও ইতস্তত করেননি। নাটক, যাত্রাপালার মধ্যে দিয়ে একথা জেনে এককালে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের কাছে টিপু সুলতান হয়ে উঠেছিলেন একজন নিজের মানুষ, এক অসীম সাহসী

স্বাধীনতা সংগ্রামী। কিছুদিন আগে টিপু সুলতানের তলোয়ার নামে একটি হিন্দি টিভি সিরিয়াল বাংলা সহ সারাভারতের বহু মানুষকে তার বীরত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়।

শুধুই কী তাই? এই কলকাতার বুকে, বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতা আর মধ্য কলকাতায় ছড়িয়ে আছে টিপু সুলতানের কত স্মৃতিচিহ্ন, কত কথা! লেনিন সরণির পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে টিপু সুলতান মসজিদ। দিল্লির জামা মসজিদের মতোই এই মসজিদের গুরুত্ব কলকাতার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে। দক্ষিণ কলকাতায় প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে শাহি টিপু সুলতান মসজিদ। খিদিরপুরের কাছাকাছি ডায়মন্ড-হারবার রোডে রয়েছে টিপু সুলতানের এক পুত্রবধূ শাহনি বেগমের তৈরি খুবই সুন্দর দেখতে শাহনি বেগম মসজিদ। আজকের টালিগঞ্জ ক্লাব, ক্যালকাটা রয়েল গল্ফ ক্লাবের জায়গা ছিল টিপু সুলতানের পরিবারের সম্পত্তি। টিপুর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকজনকে, বিশেষ করে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের প্রথমে ভেলোরে, তারপর সেখান থেকে কলকাতায় নিয়ে আসে ইংরেজরা। টালিগঞ্জ অঞ্চলে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। একসময় টালিগঞ্জ এলাকার নাচকুঠি, খাসমহল, বড়ামহল, পুল-পার নামের বাড়িগুলিতে টিপুর ছেলেরা সপরিবারে থাকত। রয়েছে টিপুর পরিবারের জন্যে বিশেষ কবরখানা।

এই দক্ষিণ কলকাতাতেই টিপু সুলতানের নামে, তার ছেলেদের নামে, নাতিদের নামে বেশ কয়েকটি রাস্তা রয়েছে যা টিপু সুলতানের কথা পথচারীদের মনে করিয়ে দেয়।

সব মিলিয়ে মনে হয় যেন টিপু সুলতান আমাদের এই কলকাতার, এই বাংলার এক আপনজন। এই আপনজনের জীবনকাহিনি, তার কীর্তিকথা নিয়েই শুরু হচ্ছে পরের অধ্যায়গুলি।

এই কথাগুলি যেমন অনুভবের প্রতিবিম্ব, তেমনি এটাও ঠিক যে মহীশূর রাজ্যকে বাদ দিয়ে কিংবা শ্রীরঙ্গাপট্টমকে উহ্য রেখে টিপু সুলতানের বিষয়ে কোনো আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

এখনকার মহীশূর শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে কাবেরীর দুই শাখায় ঘেরা শ্রীরঙ্গাপট্টম দ্বীপটি। মহীশূরের হিন্দুবংশীয় ওয়াদিয়ার রাজাদের অতীতের রাজধানী ছিল সেই ১৬১০ সাল থেকে।

ইতিহাস বলে ১৪ শতকের শেষভাগে গুজরাটের দ্বারকা থেকে বিজয় ও কৃষ্ণ নামে দুই যাদববংশীয় ভাই এসে বসবাস শুরু করেন মহীশূরে। বিজয়ের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সেই সময়কার মহীশূররাজ তার কন্যার সঙ্গে বিজয়ের বিয়ে দেন। রাজার মৃত্যুর পর পুত্র না থাকায় তিনিই হন মহীশূরের শাসক বা ওয়াদিয়ার। সেই থেকে মহীশূরে ওয়াদিয়ার রাজবংশের পত্তন হয়।

১৭৬১ সালে মহীশূর রাজ্যের ওয়াদিয়ার বংশীয় রাজার প্রধান সেনাপতি টিপু সুলতানের বাবা হায়দার আলি রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে তার জায়গাটি দখল করে নেন ১৭৬১ সালে। রাজধানী থাকে সেই শ্রীরঙ্গাপট্টমেই। ১২০০ সালে এখানে বিষ্ণু, যাকে দাক্ষিণাত্যের মানুষ রঙ্গানাথ বলে থাকে, তার একটি সুবিশাল মন্দির গড়ে ওঠে। সে মন্দির এখনও আছে। দেবতা রঙ্গানাথের নামেই দ্বীপটির নাম হয় শ্রীরঙ্গাপট্টম বা শ্রীরঙ্গাপত্তন। ইংরেজদের ভারতীয় উপনিবেশের সর্বোচ্চ প্রশাসক লর্ড ওয়েলেসলির সৈন্যবাহিনীর হাতে ১৭৯৯ সালে শ্রীরঙ্গাপট্টমে মহীশূরের বাঘ বলে পরিচিত টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর ইংরেজরা মহীশূর রাজ্যের করদ রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসায় ওই ওয়াদিয়ার বংশের উত্তরাধিকারীকে। তবে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় বেঙ্গালুরুতে। ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় পর্যন্ত বেঙ্গালুরু ছিল মহীশূর রাজ্যের রাজধানী। স্বাধীনতা লাভের পর মহীশূর রাজ্য ভারতের একটি অংশ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে কানাড়া বা কন্নড়কে সরকারি ভাষা করে ১৯৫৫ সালে কর্ণাটক রাজ্য গড়ে ওঠার পর মহীশূর রাজ্যের ভৌগোলিক বিলুপ্তি ঘটে। মিশে যায় কর্ণাটক রাজ্যের বা প্রদেশের সঙ্গে। বেঙ্গালুরু হয় এই রাজ্য বা প্রদেশের রাজধানী। অতীতের গরিমা হারিয়ে মহীশূর এখন শুধু একটা বড়ো পুরোনো শহর হিসেবেই সর্বত্র পরিচিত।

॥ বংশ পরিচয় ॥

নানান সূত্র থেকে যতদুর জানা যায়, টিপুর পূর্বপুরুষরা আরবের মক্কা নগরীর কুরেশি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ছিলেন। শোনা যায়, হুসেন বিন ইয়াহিয়া নামে জনৈক মক্কা নগরীর পরিচালক হলেন টিপু সুলতানের পূর্বপুরুষ। হুসেন বিন ইয়াহিয়ার পৌত্র আহ্‌মদ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মক্কা নগরী পরিত্যাগ করে ইয়েমেনের সানাতে বসবাস করতে বাধ্য হন। কালক্রমে সেখানে তিনি নিজগুণে সানার প্রধান শাসনকর্তার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। এমনকি, ওই শাসনকর্তা তার এক কন্যার সঙ্গে আহ্‌মদের বিবাহও দেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর আহ্‌মদ সানার শাসনকর্তা হয়ে ওঠেন। হয়ে ওঠেন সেখানকার সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ফলে শত্রুর অভাব হয় না। এসবের দরুন একসময় তিনি গোপন হত্যাকারীর হাতে নিহতও হন। আহ্‌মদের মহম্মদ নামের তেরো বছর বয়সী এক পুত্র প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বাগদাদে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে মহম্মদের পরিবার ভারতে চলে আসেন চোদ্দো কিংবা পনেরো শতক নাগাদ। এই পরিবারের শেখ ওয়ালি মহম্মদ নামের একজন ১৭ শতকের মাঝামাঝি দিল্লি

থেকে দক্ষিণ ভারতের গুলবর্গা নামে একটি জায়গায় বসবাস শুরু করেন সপরিবারে। মহম্মদ আলি নামে এরই এক ছেলে বিজাপুরের নবাব মহম্মদ শাহের সৈন্যদলে যোগ দেন। এর কিছুদিন পরেই মোগল সম্রাটের বাহিনীর কাছে বিজাপুরের নবাব পরাজিত হওয়ায় তিনি সৈন্যদল ছেড়ে বিজাপুর আর গুলবর্গার মাঝামাঝি কোলার নামের একটি নিরাপদ জায়গায় বসবাস করতে শুরু করেন। এই মহম্মদ আলির চার ছেলের মধ্যে একটি ছেলে হল ফতে মহম্মদ। মহম্মদ আলির মৃত্যুর পর ফতে মহম্মদ আরকটের নবাব সাদাতুল্লা খাঁর অধীনে সৈন্যবাহিনীর কাজ নিয়ে কোলার ছেড়ে চলে যান। বিশ্বস্তভাবে নবাবের কাজ করার জন্যে তার পদোন্নতিও হয়। তার অধীনে ৬০০ জন পদাতিক, ৫০০ অশ্বারোহী আর ৫০ জন গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। এছাড়া ছিল একটি ৫০ জনের রকেট বাহিনী। এই রকেটগুলি হত বাঁশের কাটি দিয়ে তৈরি। জয়পরাজয়ের খবর সকলকে জানাবার জন্যে এই রকেট ছোঁড়া হত। আসলে এগুলো ছিল একধরনের হাওয়াই বাজি। হাওয়াইয়ের রং দেখলে বোঝা যেত জয় না পরাজয় হয়েছে। যে-কোনো কারণেই হোক ফতে মহম্মদ নবাবের চাকুরি ছেড়ে মহীশূর রাজ্যের ওয়াদিয়ার বংশীয় হিন্দু রাজার অধীনে চাকুরি নিয়ে সেখানে চলে যান। এখানে তিনি 'নায়েক' উপাধিও পান। কিন্তু দলওয়াই বা দলপতিদের (মহীশূর রাজের মন্ত্রীদের দলওয়াই বা দলপতি বলা হতো) বিবাদ-বিসংবাদে বিরক্ত হয়ে মহীশূরের রাজার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে সিরার নবাব দরগা কুলি খাঁর অধীনে চাকুরি নিয়ে সেখানে চলে যান। ১৭২১ সালে সিরাতে এক পুত্রের জন্ম হয়। নাম রাখা হয়— হায়দার আলি। ফতে মহম্মদের ছিল চার ছেলে। তার তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন হায়দারের মা। এই স্ত্রীর গর্ভে আরও একটি ছেলে ছিল। সে ছিল হায়দারের থেকে তিন বছরের বড়ো। নাম ছিল— শাহবাজ। হায়দার আলিই